রাষ্ট্রচিন্তা

কালচারাল পলিটিক্স : উছিলা সিনেমা

- ***কামার আহমাদ সাইমন***

১। উছিলা

‘কালচারাল পলিটিক্স’ ব্যাপারটা এত বড় আর বিস্তৃত প্রেমিজের আর্গুমেন্ট যে, এক একটা দশকের জন্যই বিশাল সাইজের চার-পাঁচটা থিসিস লেখা যাইতে পারে। তাই আজকের আলোচনায় আমি মূলত সিনেমাকে উছিলা করে—সিনেমার প্রযোজনা, প্রদর্শনী, পুরষ্কার, অনুদান, সেন্সর—এইগুলা নিয়ে ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা, গল্প শেয়ার করবো, যেইগুলা হয়তো আজকের এই আলাপে কিছু সূত্র ধরায় দিতে পারে। তাই আজকের আলাপটাকে কোন প্রবন্ধ বা প্রস্তাবনা আকারে না দেখে, বরঞ্চ তার আগের প্রস্তুতি-আলাপ হিসাবে দেখা যাইতে পারে। এবং সিনেমা যেহেতু কালাচারাল ফ্রন্টের অন্যতম মিডিয়াম, তাই সিনেমার লেন্স দিয়ে আমাদের কালাচারাল পলিটিক্সের কিছু ইশারা বা প্রশ্ন পাওয়া যাইতে পারে।

আজকের এই আলাপটা মূলত গত ১০-১২ বছরে আওয়ামী রেজিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। গত ১৬ বছরের আওয়ামী শাসনামলের প্রথম ৩/৪ বছর বাদ দিলে—গত ১০-১২ বছরে যে একটা বিশেষ সময় তৈরি হয়েছিল। এই সময়কালের কালচারাল এলিমেন্ট হিসাবে সিনেমা নানানভাবে গত রেজিমের রাজনৈতিক কনস্ট্রাকশনেরও দলিল—মিথস্ক্রিয়ারও দলিল। ১০-১২ বছরের এই বিশেষ সময়ে এত বিচিত্র এবং সহস্র ঘটনা ঘটসে যে সেইখান থেকে বাছাই করা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র আপাত

কয়েকটা সহজ সূত্র, যেমন—নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র, ক্লেপ্টোক্রেসি, অলিগার্কি—ইত্যাদি দিয়ে এই বিশেষ সময়টাকে দেখি, তাহলে হয়তো এর আড়ালে লুকায় থাকা জটিল কিছু প্রশ্ন মিস করে যেতে পারি। সেইজন্য আমি এই সহজ সূত্রগুলা থেকে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছায়, এর সাব্জেটিভ ডিস্কোর্স করে আগাইতে চাই—যাতে আমার পরে যারা প্যানেলে আসবেন তাঁরা তাঁদের অব্জেক্টিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ব্যাপারগুলা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন।

গল্প—১

১৫-১৬ বছর আগের একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি—ঘটনাটা ২০০৮ বা ২০০৯ সালের। তারেক মাসুদ একটা কলাম লিখসিলেন প্রথম আলোতে, বা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এত ঘটা করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আয়োজন না করে চ্যানেল আইয়ের ফরিদুল রেজা সাগরকে ডেকে সবগুলো পুরস্কার দিয়ে দিলেই হয়। গত প্রায় দুই দশক বা তারও বেশি—আমরা এই ব্যাপারটাতে একরকম অভ্যস্তই হয়ে গিয়েছি। প্রত্যেক বছর ডজন-ডজন চলচ্চিত্র পুরস্কার একটা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মালিক নিয়ে যাবেন এবং বাকিরা টু শব্দও করবেন না।

ঘটনাচক্রে যেইদিন তারেক মাসুদের সেই ইন্টারভিউ বা লেখাটা ছাপা হয় পত্রিকায়, আমি তার সাথে একই গাড়িতে মানিকগঞ্জে যাচ্ছিলাম। সকাল থেকে একের পর এক তার কাছে যারা ফোন করছিলেন—তারা প্রায় সবাই সেই সময়ের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাদের মধ্যে আমরা কেউ কেউ এখন বিরাট বিপ্লবী, কারো ভীষণ জনপ্রিয়তা। কিন্তু মজার ব্যাপার হইলো—তাঁদের একজনও লেখাটা সমর্থন করে ফোন করেন নাই। বরঞ্চ তাদের সবারই একরকম আক্ষেপ ছিলো যে—এত বড় একজন প্রডিউসার বা পেট্রনকে উনি নাম ধরে পত্রিকায় না লিখলেও পারতেন।

গল্প—২

তাই গত ১০/ ১২ বছরে বহুল আলোচিত 'অলিগার্কি' ব্যাপারটাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পেরিফেরি/ সীমার মধ্যে না দেখে—সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বা কালচারাল পেরিফেরিতে এর অবস্থানটা চিহ্নিত করা দরকার। এবং এই কালচারাল অলিগার্কি কি নখ-দন্তহীণ কালচার? নাকি এর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চরিত্রই একে চালায়, সেই ব্যাপারটাও একটু বোঝা দরকার।

আমি এক ভদ্রলোককে চিনি যার দাদা ছিলেন—শেখ মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের অন্যতম একজন প্রভাবশালী প্রকৌশলী ছিলেন। পরবর্তীতে উনার বাবাও টানা বহুদিন আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। এবং ২০২৪'র ডামি ইলেকশনে এই ভদ্রলোক নিজেও প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। গত ১০/ ১২ বছরে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে বিগত রেজিমের যুবরাজের সাথে এই ভদ্রলোকের সখ্যতা বহুল প্রচারিত।

লক্ষণীয় বিষয়—(১) প্রভাবশালী রাজনৈতিক উত্তরাধিকার, (২) বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবসার বিশাল লিগেসি, (৩) চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে হাজার হাজার কোটি টাকার হোটেল সাম্রাজ্য—

উত্তরাধিকার এই ভদ্রলোকের কোম্পানির নাম বেনামে শোনা যায় আমাদের বিখ্যাত দরবেশ পরিচালিত শেয়ার বাজার সিন্ডিকেটেও।

বিশাল সাম্রাজ্যের তরুণ উত্তরাধিকার এই ভদ্রলোক যখন পশ্চিম থেকে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে এসেছিলেন, তার সাথে ছিলেন তার ইউরোপীয় স্ত্রী। বাংলাদেশে এসে সেই বিদেশিনীর তেমন কিছু করার ছিল না। কিন্তু আর পাঁচটা ইউরোপিয়ান বা কনস্যুলেট-স্ত্রীদের মতোই উনার ইচ্ছা ছিল "পোস্ট-কলোনিয়াল দরিদ্র বাংলাদেশের" আর্ট-কালচারের জন্য কিছু করার। তার সেই খায়েশ মেটাতেই—২০০৪ সালে, এক রকম খেলনা হিসাবেই গড়ে উঠেছিল—বাংলাদেশের প্রথম মাল্টিপ্লেক্স।

৬০-৭০-৮০-৯০'র দশকে গড়ে উঠা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি—৮০-৯০'র দশকের চলচ্চিত্র আন্দোলন, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-কলা কুশলী বা শূন্য দশকের আর্ট-হাউজ ফিল্মমেকার—কারো সাথে কোন প্রকার বোঝাপড়া, সংযুক্তি বা আদানপ্রদান ছাড়াই—সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির পপ-কর্ন কালচার এবং কর্পোরেটাইজেশনের দাপটে এই ভদ্রমহিলা চলে এসেছিলেন সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির পাওয়ার ডিনামিক্সের একদম কেন্দ্রে।

ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা—যদিও সেইগুলাও মান্ধাতার আমলের এবং করাপ্ট সিন্ডিকেটের দখলে—সম্পূর্ন পাশ কাটিয়ে দেশের প্রথম এবং প্রধান এই মাল্টিপ্লেক্স, চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিকে দূরে ঠেলে, হলিউডকেন্দ্রিক সিনেমার গ্লোবাল ফ্রাঞ্চাইজির স্রেফ একটা দোকান হিসাবে গড়ে উঠেছিলো।

এক এগারোর পট-পরিবর্তনের সাথে সাথে, এই ভদ্রমহিলার শ্বশুর গ্রেফতার হন এবং ভদ্রমহিলা তার দুই সন্তানকে নিয়ে ফিরে যান ইউরোপে। এরপর মাল্টিপ্লেক্সের সিনে আসেন সেই ভদ্রলোক। দেশী নির্মাতাদের উনি প্রায়ই বলেন, বাংলাদেশী ছবি উনি চালান 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি' (CSR) থেকে—হলিউড-বলিউডের ছবির ব্যবসা করাই তার মূল উদ্দেশ্য। ছবি মুক্তি দেওয়ার দাঁয় মাথায় নিয়ে দুনিয়াব্যাপী প্রশংসিত ও পুরস্কৃত ছবির নির্মাতাদেরও দেখেছি উনার কথায় বোকা বোকা হেসে চুপ করে থাকতে বা মাথা মাথা হেঁট করে বসে থাকতে।

বেশ অনেক বছর হইলো, "ইউরোপিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব" নামে হাস্যকর চলচ্চিত্র উৎসব হয় এই মাল্টিপ্লেক্সে। এই উৎসবের ওপেনিং পার্টিতে থাকেন মূলত বারিধারার বেকার কন্সুলেট-স্ত্রীরা। এই ভদ্রলোকের জন্য মাল্টিপ্লেক্স ছিলো সামাজিক শক্তি সঞ্চয়ের সোশ্যাল ফেইস মাত্র। দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা আর্ট হাউজ বা সাধারণ দর্শক, কারো সাথেই এর তেমন কোন যোগাযোগ নাই। গত কয়েক বছর আমাদেরই একজন প্রযোজক অনুষ্ঠানটার আয়োজন আর প্রোমোশনের দায়িত্ব নিয়েছেন—একটা ব্যবসায়িক এঙ্গেজমেন্ট হিসাবে।

গল্প—৩

তাই দোষটা শুধু কালচারাল অলিগার্কদের দিলে হবে না। আমাদের নিজেদের দিকেও তাকাইতে হবে। বাংলাদেশে সরকারী অনুদানে গত ১৬ বছরে কি ছবি, কারা বানিয়েছেন, কয়টা মুক্তি পেয়েছে—এইগুলা পাবলিক ইনফরমেশন, যে কেউ এইগুলা নিয়ে একটু গবেষণা করলেই ভয়াবহ চেহেরাটা বের হয়ে আসবে। কিন্তু এর বাইরেও আমলা-কেন্দ্রিক কমিটিগুলা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে।

চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির একটা মিটিঙে একদিন সচিবালয়ে গিয়ে দেখি, আমাদের শ্রদ্ধেয় একজন নির্মাতা, ক্রিটিক্যাল ফিল্ম-ফ্যাটার্নিটির ছোট একটা অংশের মধ্যে হইলেও, তরুণ নির্মাতাদের মধ্যে যার একটা পজিশনিং আছে বা ছিলো—তিনি দুই হাত জড়ো করে, অলমোস্ট উবু হয়ে চেয়ারে বসে আছেন—তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ডঃ মুরাদের সামনে। যার এক পাশে বসে আছেন তথ্যসচিব আরেক পাশে নায়িকা কবরী।

ডঃ মুরাদকে হয়তো অনেকেই মনে করতে পারবেন, একজন জনপ্রিয় "নায়িকা"র সাথে তার একটা আপত্তিকর ফোনালাপ লিক হয়েছিল কয়েক বছর আগে, যেই ফোনালাপে ক্ষমতা-কাঠামো এবং শিল্পীর মাঝখানে দেনা-পাওনার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের প্রকৃতি বা সম্পর্কের ভাষা থেকে—গত ১০/১২ বছরে সরকার এবং রাষ্ট্রের সাথে কালচারাল ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্ক কি রকম ছিল—কিছুটা হলেও টের পাওয়া যায়।

নায়িকা কবরীকে এখনকার প্রজন্ম হয়তো একরকম চেনেন না, কিন্তু আমরা যারা নব্বইয়ের দশকে ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম ছবিকে কাল্ট সিনেমা মেনে বড় হয়েছি—তাদের কাছে কবরী মানে রাজারঝি—আশির দশকে কবরী ছিলেন মধ্যবিত্ত বাংলা সিনেমার অন্যতম প্রিয় মুখ। জনতার এই সব প্রিয় মুখ একে একে ক্ষমতার প্রিয় মুখে রূপান্তরের এই যাত্রা গত ১০/১২ বছরের একটা অন্যতম কালচারাল ট্রেন্ড বা সাংস্কৃতিক প্রবণতা।

নায়ক ফেরদৌসকে নিয়ে এখন অনেকেই ট্রল করছেন, কিন্তু এই যাত্রাতো নায়ক ফেরদৌস বা ক্রিটেকার সাকিবকে দিয়ে শুরু হয় নাই। এর অনেক আগেই আমরা ক্যাপ্টেন মাশরাফীকে হারিয়েছিলাম। প্লট, পদক আর পাওয়ারের লোভে তারও আগে হারিয়েছিলাম সুবর্ণা মোস্তফা বা মমতাজের মত গুণী শিল্পীদের। এই ভয়াবহ রেজিমের প্রোপাগান্ডা মেশিন—CRI এর অন্যতম কারিগর বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় একটা ব্যান্ডের লিড। মুগ্ধর মতো ফ্রিল্যান্সার তরুণেরা যখন মিছিলে ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে গিয়ে গুলি খাচ্ছিলেন, আমাদের এইসব প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা তখন মানুষের উপর গরম পানি ঢালতে বলছিলেন।

শিল্পী: সুলতান ইশতিয়াক

২। এম্বেডেড কালচার

কনসেপ্ট

এই যে, Aestheticization of Politics, Lumpenisation of Culture বা vandalization of Cinema—গত ১০/ ১২ বছরের টেক্সট রিডিঙে এইগুলাকে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নাই। এর একটা আরেকটাকে আগায় গেছে, বল দিসে, সাহস দিসে। Aestheticization of Politics বা Lumpenisation of Culture বা Vandalization of Cinema একদম প্রাত্যহিক জায়গা থেকে বুঝতে সাংবাদিকতার একটা ধারণা থেকে ধার করতে চাই। অনেকেই এই কনসেপ্টটা জানেন, তবু নতুনদের একটু খুলে বলা দরকার। ঘটনার শুরু ইরাকে

মার্কিন আগ্রাসনের সময় থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাকে আক্রমণ চালায় তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরাসরি সংবাদ প্রচার করার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনী কিছু প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের নিয়ে যান ইরাকে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় তারা যুদ্ধক্ষেত্রের লাইভ ধারা বর্ণনা করেন, গ্লোব্লাইজড পৃথিবীর ঘরে-ঘরে স্যাটেলাইট টেলিভিশন খবরের প্রাইম-টাইম লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট প্যাকেজে পৌঁছে দেন।

এর আগে যেটা হইত যে, সৈন্যবাহিনী তাদের নিজেদের প্রোপাগান্ডার টুলস বা ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমেই সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ প্রচার করতো। স্যাটেলাইট যুগের আগে সিনেমা হলগুলোতে এক রকমের প্রোপাগান্ডা নিউজরিল চালানোর রেওয়াজ ছিল। কিন্তু ইরাকে মার্কিন বাহিনী যখন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের নিয়ে গেল, তখন সাংবাদিকতার যে মৌলিক প্রস্তাবনা—একাধিক পক্ষের মাঝখানে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সংবাদ পরিবেশন করার যে দায়িত্ব—সেই রোলটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেল। একাধিক পক্ষের মধ্যে থেকেও, সংবাদ মাধ্যম একটা পক্ষের পয়েন্ট-অফ-ভিউ হয়ে গেল। খুব সম্ভব এখান থেকেই সাংবাদিকতায় একটা নতুন ধারনার শুরু, যার নাম—'এম্বেডেড জার্নালিজম।'

এম্বেডেড জার্নালিজমের এই কনসেপ্ট থেকে ধার করে বলতে চাই—গত ১০/ ১২ বছরে আমাদের এইখানে যে কালচারাল লুম্পেনাইজেশন হইসে, সেইটা এম্বেডেড জার্নালিজমের মতোই, নতুন একটা কালচারাল প্র্যাকটিস—যাকে এম্বেডেড কালচারাল প্র্যাকটিস হিসাবে চিহ্নিত করতে চাই। এইখানে ক্লাচারাল ফ্রন্ট একটা পক্ষ নিয়ে, সেই একটা পয়েন্ট অফ ভিউই কেবল রিপ্রডিউস করে গেছে। এইটা আমরা প্রকটভাবে উপলব্ধি করেছিলাম ২০১৩ সালের শাপলা-শাহবাগ বাইনারি সময় বা তারপর থেকে। আশ্চর্য ঘটনা হইলো এই এম্বেডেড কালচারাল প্র্যাক্টিস যতটা না সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হইসিল—তার চাইতে অনেক বেশি উৎসাহ নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি কর্মীরাই একরকম ঝাঁপায় পড়সিলেন। এবং এই এম্বেডেড কালচারের অন্যতম প্রযোজনা—'জাতীয়তাবাদী প্রকল্প'—দিয়ে দেশটাকে ভাগ করসিলেন স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট

তাত্ত্বিক বিচারে জাতীয়তাবাদের প্রত্যেকটা লড়াইয়ে একটা 'অপর' বা শত্রু নির্মাণ জরুরি। যেমন পরাধীন পূর্ব-বাংলায় সেই শত্রু ছিলো পশ্চিম-পাকিস্তান, পরাধীন ভারতে সেই শত্রু ছিল ব্রিটিশ। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ প্রকল্পে নিজের দেশে, নিজের সমাজেই শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করা শুরু হইলো। হাজার বছরের ইসলামিক ট্র্যাডিশনে এজমালি আচার-অনুষ্ঠানকেও হরে-দরে 'মৌলবাদ' তকমা দেওয়া হইলো। দেশের বৃহৎ জনগোষ্টিকে অপর হিসাবে চিহ্নিত করা হইলো—দাঁড় করানো হইলো 'স্বাধীনতার চেতনা' নামক একটা উগ্রবাদী প্রকল্পের বিপরীতে।

এই উগ্রবাদী বা পরিকল্পিত প্রকল্পের একদম ফ্রন্টলাইনে ছিল কালচারাল ফ্রন্ট। উদাহরণ হিসাবে নাম নিতে হইলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নাম নিতে হবে। অনেকেই জানেন বা জানেন না—আশির দশকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ছিল একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বৈরাচার বিরোধী কালচারাল ফ্রন্ট। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ এর মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক বা রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মত বিক্ষুব্ধ কবিরা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। আশির দশকের শর্ট ফিল্ম ফোরাম আন্দোলন, কবিতা পরিষদ উৎসব, বা সময় গ্রুপের আর্টিস্ট পেইন্টাররা ছিলেন এর অংশীজন।

৭১ পরবর্তী স্বাধীন দেশে, পুরো নব্বইয়ের দশক জুড়ে—সম্মিলিতভাবে এইসব অংশীজনেরাই আজকের অপরায়ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গুইসটিক কন্ট্রিবিউশন হইল 'স্বাধীনতার চেতনা বনাম মৌলবাদ'। এই বিভাজন ব্যক্তি পর্যায়ে কতটা গভীরভাবে আমাদেরকে আসক্ত করেছিল—তার জ্বলজ্বলে স্মৃতি শাপলা-শাহবাগ বিভাজন এবং তার পরবর্তী মিথস্ক্রিয়া।

সম্ভবত ২০২০-২১ সালের মার্চ মাসের ঘটনা, একসাথে তিনটা ওটিটি কন্টেন্ট নিয়ে তখন একটা—গেল গেল—আওয়াজ উঠেছিল। ৫০ জনের একটা গ্রুপ বিবৃতি দিলেন—বিবৃতির বিষয় ওটিটিতে স্বাধীনতার চেতনা এবং দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষা। মজার ব্যাপার হইলো, আমরা যারা ঘটনার পরম্পরা জানতাম, আমাদের নিজেদের আলাপে পরিষ্কার শুনলাম, বিবৃতির ঘটনাটা চ্যানেল আই ইন্সটিগেটেড। ওটিটির দাপটে চ্যানেল আইয়ের কালাচারাল অলিগার্কি তখন হুমকির মুখে। বিবৃতি দানকারী ৫০জনই চ্যানেল আইয়ের নিয়মিত সুবিধাভোগী চিহ্নিত সিনিয়র শিল্পী।

ফিল্ম এলায়েন্স বাংলাদেশ

এই ঘটনার পর আমরা কয়েকজন অপেক্ষাকৃত তরুণ নির্মাতারা একটা whatsapp গ্রুপ শুরু করলাম—এই চিন্তাটা মাথায় রেখে যে আমরা যদি এক্ষুনি সংগঠিত না হই তাহলে কোনভাবেই আর ছবি বানানো যাবে না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলাম, এই তরুনেরাও কমবেশি সিস্টেমের হালুয়া-রুটিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। চুপচাপ গ্রুপ ছাড়তে বাধ্য হইলাম, নিজের কাজে ফিরে গেলাম।

বছরখানেক পর, দুইটা ছবিকে নিষিদ্ধ করার সূত্র ধরে দেখলাম তরুণ নির্মাতারা আবার একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করছেন—'ফিল্ম অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ' নামে। কিন্তু দুইদিন না যাইতেই দেখি সেই গ্রুপের নেতৃত্বে একজন চিহ্নিত সংস্কৃতিজন, ৭১'এ যার বয়স ছিলো মাত্র ২১। যিনি ৭১'এর সেই গেরিলা পরিচয়কে পুঁজি ব্যবসা করেছেন বাকি জীবন। নেতৃত্বের বাকিরাও কমবেশি বিতর্কিত এবং সরকারী প্রজেক্টে নিমজ্জিত। এদের মধ্যে এমন নির্মাতাও ছিলেন, যিনি নিজেকে ফ্যাসিস্ট নির্মাতা হিসাবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন এবং কথায় কথায় তথ্য মন্ত্রীর সাথে চা খাওয়ার গল্প করতেন। সব জেনে-বুঝেও চেষ্টা করলাম, 'ফিল্ম অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ' ব্যানারে কাটা তাঁরের বেড়ার পিছনে পাশাপাশি বসলাম—উদ্দেশ্য, সিনেমার উছিলায় হইলেও যদি প্রতিবাদের একটা ক্ষেত্রে তৈরি করা যায়।

আপনাদের কারও কারও মনে থাকতে পারে, কাটা তাঁরের বেড়ার পিছনে বসে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন নির্মাতা-শিল্পীরা সবাই মিলে। মজার ব্যাপার হইলো, আমাদের সেই সংস্কৃতিজন সংবাদ সম্মেলনের ঠিক আগে এই কাটা তাঁরের বেড়াও তুলে দেওয়ার ব্যাপক চেষ্টা করসিলেন। শক্তভাবে সেইটা প্রতিহত করলাম। ঐ মূহুর্তে তথ্যমন্ত্রী দেশের বাইরে ছিলেন, ফিরে এসে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে দেখা করতে চাইলেন 'ফিল্ম এলায়েন্স বাংলাদেশ' এর প্রতিনিধিদের সাথে। আমরা এক-একজন তখন ঢাকার একেক প্রান্তে। অনলাইন মিটিঙে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হইলো, তথ্যমন্ত্রীকে একটা স্মারকলিপি দেওয়ার প্রস্তাব একরকম জোর করেই পাঁশ করাইলাম। কালেক্টিভ সিদ্ধান্ত, মিটিং করে, আলোচনা করে নেওয়া—চিঠি কম্পোজ হইলো, প্যাডে বানায় প্রিন্ট নেওয়া হইলো।

বিকালে টেলিভিশনের খবরে দেখলাম সেই সংস্কৃতিজন তথ্যমন্ত্রীর সাথে চা খাচ্ছেন। হাসিমুখে মিডিয়াকে জানাচ্ছেন, আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। স্মারকলিপি ব্যাপারটাই উধাও! অথচ আমাদের প্ল্যান ছিলো, এই সুযোগে সেন্সর বোর্ড থেকে শুরু করে, অনুদান, পুরষ্কার সবগুলাতে হাত দিবো। ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে নিজেকে গুটায় নিলাম। কয়েকদিন পর আবার সতীর্থ নির্মাতাদের ফোন, একটা টেলিভিশন গোল-টেবিলে যেতে হবে। আমাকে জোর করা হইলো এই বলে যে, ঐখানে আইনমন্ত্রী থাকবেন—এই সুযোগে চলচ্চিত্র বিষয়ক আইনগুলা নিয়ে উনার সাথে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে আমি ছাড়া যোগ্য আর কাউকে উনারা ভাবতে পারছেন না—তেল সব মানুষই খাঁয়, আমিও খাইলাম। গিয়ে দেখি গোলটেবিলে সেই সংস্কৃতিজনও বসে আছেন। হতাশ হইলাম, তবু অপেক্ষা করলাম।

অনুষ্ঠান শেষে আইনমন্ত্রীকে বিষয়টা বুঝায় বললাম, সুন্দর চেহারার হাসিখুশি মানুষ। এখন আমরা যেইসব খবর পাচ্ছি, সেইগুলা তখন এইভাবে জানা-বোঝার সুযোগ ছিলো না। আইনমন্ত্রী খুবই খুশি হয়ে তাঁর কার্ডটা দিয়ে বললেন, "ফোন করে চলে আইসেন। তথ্যমন্ত্রণালয় থেকে ড্রাফটা এখন আমার টেবিলেই আছে। আমি ভেট দিয়ে মন্ত্রীপরিষদে পাঠায় দিলে আর কিছু করার থাকবে না।" এর মধ্যেই পিছন থেকে টেনে ধরলেন সেই সংস্কৃতিজন। বললেন আমরা এখন আইনমন্ত্রীর কাছে যাবো না, আগে একটা বড় অনুষ্ঠান করবো ফিল্ম এলায়েন্স বাংলাদেশের। বিরক্ত হয়ে গ্রুপে লিখলাম, বার বার তাগাদা দিলাম—এক্ষুনি আইনমন্ত্রীর সাথে দেখা করা দরকার। কেউ উত্তর দিলো না। আবার হতাশ হইলাম, ফিরে গেলাম নিজের কাজে।

কয়েক মাস পরে আবার গ্রুপ থেকে কল। আমরা একটা বড় অনুষ্ঠান করছি বাংলা একাডেমীতে, আপনাকে একটা পেপার পড়তেই হবে। সবাই নাকি সিদ্ধান্ত নিসে আমাকেই লিখতে হবে। নিমরাজি হয়ে ছোট একটা সেলফ-সেন্সরড লেখা রেডি করলাম, যেইদিন অনুষ্ঠান সেইদিন সকালে পত্রিকায় ছাপায় দিলাম লেখা—এই ভয়ে যে আবার না কেউ গায়েব করে দেয়। সেশনের শেষে আইনমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের আসতে বলেছিলাম, আপনার আসলেন না কেন? ড্রাফটতো আইন মন্ত্রনালয়ের ভেট দিয়ে মন্ত্রী পরিষদে পাঠায় দেওয়া হয়েছে।" মেজাজ খারাপ করে বের হয়ে যাচ্ছি, অডিটোরিয়ামের বাইরে ধরলেন সেই সংস্কৃতিজন। জোর করে ছবি তুললেন অনেকগুলা, তুলে ফেইসবুকে পোস্ট দিলেন। পরে ঘনিষ্ট একটা সূত্রে জেনেছিলাম, উনি সংসদ নির্বাচনের টিকেট চাচ্ছিলেন। ফিল্ম এলায়েন্স বাংলাদেশ ছিলো তাঁর সাংসদ হওয়ার দৌড়ে একটা প্রজেক্ট মাত্র।

একটি কবিতা, কাক ও কবিদের বিপদ

বুয়েটে পড়ার সময় থেকেই কার্টুনিস্ট কিশোরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। নজরুল ইসলাম হলে আমার পাশের রুমে নিয়মিত আসতো। তাই স্বাধীনতার ৫০ বছরে সৃষ্টিশীল লেখক মুস্তাকের মৃত্যু এবং কাটুনিস্ট কিশোরের নির্যাতনের প্রতিবাদে একটা কলাম লিখেছিলাম পত্রিকায়। শিরোনাম—"একটি কবিতা, কাক ও কবিদের সকাল।" লিখেছিলাম—"সব দেশে, সব সমাজেই অন্যায় হয়, এই কথাটা ইদানীং খুব শুনি। কিন্তু যে সমাজে শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে শামিল হন না, সেই সমাজের অন্যায়ের ভাগ তাঁদের কাঁধেও এসে পড়ে। শিল্পীরা সমাজের চোখ, জাতির মনন। শিল্পীরা নীরব হয়ে গেলে ভাষা হারিয়ে ফেলে জাতি, রাষ্ট্র হারায় পথ। ভূমিকম্প আগে টের পায় কাক, সমাজের ক্ষয় আগে টের পাওয়ার কথা কবিদের।"

এই লেখার পর প্রথম ফোনগুলো পেয়েছিলাম সংস্কৃতিজন-নাট্যজন-শিল্পী-নির্মাতা বন্ধুদের কাছ থেকেই। এশিয়া এনার্জির দালালি করে দেশের তেল-গ্যাস বিক্রি করতে ইনাদের সমস্যা হয় না, সেই কাজগুলা হয় গভীর রাতে—গুলশান, বনানী, বা বারিধারা—যাকে উনারা ভালোবেসে ট্রাইস্টেট ডাকেন... সেই ট্রাইস্টেটের কোন এক লিফটে মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় এদের কাউকে কাউকে আমি নিজেই দেখেছি হয়তো। কিন্তু দিনের বেলায় এদের শুভ্র চেহারা আর খাদি পাঞ্জাবী দেখে বোঝার উপায় নাই, নিচে কত দাগ লেগে আছে।

আমার সেই কলাম পড়ে এদেরই কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন—স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে আমার পজিশন নিয়ে। কলামের লেখা কথাগুলোই তাদেরকে রিপিট করেছিলাম, বলেছিলাম—"দেশ, রাষ্ট্র, সরকার আর সমাজ—চারটা আলাদা জিনিস। এদের নিজেদের স্বার্থেই আলাদা রাখতে হয়। সরকারের কোনো একটা কাজের বিরোধিতা মানে, সরকার বিরোধিতা নয়, রাষ্ট্রবিরোধিতা তো নয়ই। একটা স্বাধীন দেশে প্রতিটা অন্যায়ই প্রতিবাদযোগ্য, ধিক্কারযোগ্য। একটা স্বাধীন দেশে প্রতিবাদ আমার মৌলিক অধিকার। একটা স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে স্বাধীনতার ৫০ বছরে অন্তত এইটুকু আমার পাওনা।"

আমার কথাগুলো তাদের পছন্দ হয় নাই। আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আমি বিপদে পড়বো। বিপদে আমি পড়েছিলাম, সেই বছরেই ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়েছিলো আমাদের ওয়াটার ট্রিলজির ২য় ছবি—'অন্যদিন...' আঁট বছর ধরে বানানো ছবি। হাজারটা বুরোক্রেসি, টেকনিক্যাল ঝামেলা ম্যানেজ করে, রক্তপানি করে বানানো ছবি। টানা দুই বছর একটার পর ক্রিটিক্যাল সব উৎসবে পুরষ্কার/ প্রদর্শনী করে বেড়াইলাম ছবিটা, কিন্তু দেশে মুক্তি দিতে পারলাম না। উল্টা সেন্সর বোর্ড থেকে এমন একটা প্রেমপত্র (চিঠি) দেওয়া হইলো যাতে নিজেকে মনে হইলো রাষ্ট্রদ্রোহী। আঁতে ঘা লাগল, ভাবলাম ছবিই আর বানাবো না।

আমলাতন্ত্র

একবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার অনুষ্ঠানে, অডিটোরিয়ামে ঢোকার মুখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতিপ্রেমী একজন ব্যুরোক্র্যাটের সাথে দেখা। আমাদের ওয়াটার ট্রিলজির প্রথম ছবি 'শুনতে কি পাও!'এর জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার পেয়েছিলাম সেই বছর। মন্ত্রণালয়ের এই ভদ্রলোক এর আগে সেন্সর বোর্ডের উচ্চতম পদে ছিলেন, 'শুনতে কি পাও!' ছবিটা আটকায় রাখসিলেন অনেকদিন। উনার বক্তব্য ছিলো, "আমরা রাস্তায় দাঁড়ায় প্রস্রাব করি, তাই বলেতো রাস্তায় প্রস্রাব করার মতো দৃশ্য আমরা সিনেমায় দেখাবো না।"

সুন্দরবনের পাড়ে তিন বছর একটা গ্রামে, খেয়ে না খেয়ে বানানো ছবি 'শুনতে কি পাও!'—এই জনপদের মাটি আর মানুষের হার না মানার গল্প। সেই ছবিতে সংস্কৃতিপ্রেমী ভদ্রলোক 'রাস্তায় প্রস্রাব করার মতো দৃশ্য' কোথায় পেলেন বুঝতে পারলাম না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অডিটোরিয়ামের মুখে জোর করে, হাত ধরে কচলাইতে শুরু করলেন। বললেন—"একবার দেখাও করলেন না, চা খাওয়াইলেন না, সোজা পুরষ্কার নিতে চলে আসছেন?"

মাথায় রক্ত উঠে গেলো, বললাম, "বলেনতো এক্ষুনি চলে যাই।" সংস্কৃতিপ্রেমি ব্যুরোক্র্যাট ঘাবড়ায় গেলেন, জোর করে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে বসাইলেন। এই উচ্চশিক্ষিত রাজ-কর্মচারী আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে এখন কানাডার বেগমপাড়ায় থাকেন। 'ব্যাড টাচ' অভিজ্ঞতাটা শুধু মেয়েদের হয় না,

ছেলেদের ক্ষেত্রেও এইটা প্রযোজ্য। উনার জোর করে হাত ধরে কচলানো বা পিঠে হাত বুলানো—দুইটাই আমার জন্য 'ব্যাড টাচ' ছিলো।

সরকার ঘনিষ্ট নির্মাতা বন্ধুদের কেউ একজন একদিন ফোনে দাওয়াত দিলেন। বললেন, বাংলাদেশের সিনেমা নিয়ে ঘরোয়া আলাপে কথা বলতে চান গত রেজিমের ছোট রাজপুত্র, যিনি তখন ঢাকায় থাকতেন। উনি চান, তাই আমাদের যেতে হবে—এইটা কি 'নির্দেশ' নাকি 'অনুরোধ' বোঝা কঠিন। না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই—আমার ছোট্ট ছেলেটা ভয় পায়। জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, তুমি না গেলে তোমাকে যদি ধরে নিয়ে যায়।"

ক্ষমতার একদম কেন্দ্র থেকে এইরকম অস্বস্তিকর নিমন্ত্রণ এইটাই প্রথম ছিল, তা না। এর আগেও গত ১০/১২ বছরে বেশ কয়েকবার এইরকম নির্দেশ বা অনুরোধ পেয়েছিলাম। একবার তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চলচ্চিত্র নীতিমালা সংক্রান্ত একটা চিঠি পেয়েছিলাম, নিচে লেখা—"নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইলো।" কমিটির অনেকের মধ্যে আমার নামও লেখা, আমার সাথে কোন প্রকার আলোচনা না করেই।

চিঠি পাঠিয়ে সরকারী গণমাধ্যমের উচ্চতম পদাধিকারী আরেকজন সংস্কৃতিজন ফোন দিয়ে বললেন, "কালকে চলে আইসেন।" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তরে বললাম, "আমিতো কালকে কলকাতায় যাচ্ছি।" উনি সাথে সাথে বললেন, "আচ্ছা ফিরে এসে ফোন দিয়েন।" কলকাতায় আমার যাওয়ার কথা এক সপ্তাহ পরে। বাকি এক সপ্তাহ অচেনা কারো ফোন ধরি নাই, বাইরেও বের হই নাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। উচ্চতম পদাধিকারীর কাছ থেকে নিজেকে যতটা না লুকাই, তাঁর চাইতে বেশি লুকাই—কমিটির বাকি সদস্যদেরকাছে থেকে—যাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, যারা সবাই সংস্কৃতিসেবি, শিল্পী, নির্মাতা।

শিল্পী : সুলতান ইশতিয়াক

৩। ডিস্টোপিয়ান কালচার

সেলফ-সেন্সরড কাঁচের বাক্সের

আমার চলচ্চিত্রযাত্রার পুরা সময়টাই কাটসে একটা অজানা ভয়কে ডিল করতে করতে। আমি যে ছবিটা বানাইছি তারচেয়ে বেশি আমাকে কষ্ট পাইতে হইসে—আমি যে ছবিটা বানাইতে পারি নাই, তাঁর জন্যে। গত পনেরোটা বছর ছিলো আমার বা আমার মতো আরও অনেকের জীবনে শ্রেষ্ঠতম সময়। কিন্তু এই পুরা সময়টাই আমরা ছিলাম একটা অদৃশ্য সেলফ-সেন্সরড বাক্সের ভিতর। এর দাঁয়তো শুধু হাসিনাকে দিলে হবে না। একজন হাসিনা বা শুধু পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে আইডেন্টিফাই করাতো খুবই সহজ।

কঠিন হইলো, এই অদৃশ্য বাক্স আর বাক্সের কারিগরদের আইডেনটিফাই করা। একটা স্বাধীন দেশে চেতনার পক্ষে আর বিপক্ষে বিভাজনের এই কালচারাল পলিটিক্স আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, শিল্পী, সাহিত্যিক,

বুদ্ধিজীবী, নির্মাতারাই উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন করে গেছেন—এই কালচারাল পাটাতনেই হাসিনার মতো ফ্র্যাংকেন্সটাইনে তৈরি হইসিলো। যেই বিভাজনে ভর করে সেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আবার তাঁর এজেন্সিগুলা তৈরি করসিলো, যেই এজেন্সিগুলা শাপলা চত্বরেই প্রকট হয়ে গেছিলো—কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি নাই। কারণ শাপলা চত্বরের জনগোষ্ঠী আমাদের বাইনারি বিভাজনে ঊনমানুষ—সম্পূর্ন মানুষের মর্যাদা আমরা তাঁদের দেই নাই।

এন্ডর্সমেন্ট নাকি ডিসকম্ফোর্ট

এন্ডর্সমেন্টের বিনিময়ে যারা প্লট-পদক-পদবীর ব্যবসা করছেন, তাঁদের লিস্টতো সরকারী নথিতেই পাওয়া যাবে। যারা সাধারণ মানুষের উপর গরম পানি ঢালার কথা বলেছেন, অথবা এখনো যারা খেলাফা-ই-বাংলার গল্প বলে মানুষকে বিভাজিত করার রাজনীতি করছেন—তাঁদের অপরাধ আইনের আওতায় আনা হবে আশা করি।

কিন্তু যারা এই প্রসেসে এথিক্যাল বা মরাল ফুয়েল জোগাইছেন—এই পৈশাচিক বীভৎসতা দেখেও যারা চুপ করে ছিলেন বা এখনো আছেন—আমার প্রশ্ন সেইসব শিল্পজনের কাছে। আমি তাঁদের কাছে জানতে চাই, শিল্পের কাজ কি এন্ডর্সমেন্ট নাকি ডিসকম্ফোর্ট? হাসিনা নামক ফ্র্যাঙ্কেন্সটাইন এবং তার এজেন্সি যে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করলো—তার রক্ত কি আমাদের হাতেও নাই? নাকি আছে বলেই আরও বেশি অস্বীকার করি?

মেমরি অফ আ নেশন

কালচারাল পলিটিক্সের এই একই প্রশ্ন যদি সিনেমার উছিলায় করি—যদি জিজ্ঞাসা করি, কোন পক্ষ-বিপক্ষ না নিয়ে সিনেমা এখানে কি করতে পারতো? তাহলে সিনেমার বেসিক সংজ্ঞায় ফেরত যাইতে হবে। সামাজিক ইতিহাসের অডিও-ভিজুয়াল দলিল হইলো সিনেমা—যে কারণে সিনেমাকে বলা হয়ে থাকে—'মেমরি অফ আ নেশন'। এক এক দশকের সিনেমা দিয়ে সেই দশকের সময় এবং সমাজকে আইডেন্টিফাই করা যায়। গত ২০১০-১২ থেকে ২০২৪ সালের কয়টা সিনেমার নাম আমরা মনে করতে পারি যেইটা এই সময়ের, এই জনপেদের মানুষের কথা বলে?

কথাটা শুধু সিনেমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা কিন্তু না। গত এক যুগে ঢাকার গ্যালারিগুলাতে গেলে মনে হইতো, গুগলে এক্সহিবিশন লিখে সার্চ দিসি। শিল্পকলায় গেলে মনে হইতো পঞ্চাশ বছর আগে মৃত এক নবীর মাতমে মাতোয়ারা একটা ডিস্টপিয়ান সিটি। অথচ কালচারের কাজ ছিলো অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মাঝখানের অডিও ভিজুয়াল ব্রিজ হিসাবে কাজ করা। তাই শিল্পের কারিগরদের এরকম বলার বা ভাবার সুযোগ নাই যে—আমি শুধুমাত্র একজন শিল্পী, আমি কোন রাজনীতি বুঝিনা। যারা এইটা বলেন, তার আসলে মানুষকে বোকা ভাবেন।

Art—a social contract

জাতি হিসাবে আমরা আজকে যে ট্রমার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাঁর সুলুক সন্ধান করাই এখন শিল্প চর্চার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। গত ১০/ ১২ আমরা যে সিনেমাগুলা বানাইতে পারি নাই, যেই ছবিগুলা আঁকতে পারি নাই,

যেই গানগুলা লেখার আগেই সেলফ-সেন্সরড হয়ে গেছে, যেই এক্সহিবিশনগুলা বাতিল হয়ে গেছে—সেইগুলার একটা খতিয়ান নেওয়া জরুরি।

বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্ন করা উচিৎ—কিন্তু সেইটা করতে গিয়ে আমরা আবার নতুন আরেকটা বিভাজন ট্র্যাপে না পড়ি সেইটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। Art is a social contract—ক্ষমতার সাথে না, সমাজের কাছে চুক্তিবদ্ধ থাকতে হবে শিল্প এবং শিল্পীকে। ইতিহাসের অমীমাংসিত প্রশ্নগুলা খুঁজতে হবে। প্লট-পদক-পদবীর এবং বিভাজনের রাজনীতির পিছনেও লুকানো কোন শ্রেণী প্রশ্ন আছে কিনা—খুঁজে দেখতে হবে, বিশেষ করে ১৮৫৭'র পর থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আইডেন্টিটি পলিটিক্সের ইশারাগুলা বুঝতে হবে।

১৯৪৭ বা ১৯৭১ এ গণ-মানুষের আকাঙ্ক্ষা যেইসব শিল্পী পড়তে পারেন নাই, ইতিহাস তাঁদের খারিজ করে দিসে। ২০২৪ আমাদের আবার আরেকটা নতুন সুযোগ করে দিসে, কালাচারাল পলিটিক্সে, জনপরিসরে—কোথাও এইসব অমীমাংসিত প্রশ্ন এড়ায় যাওয়ার আর সুযোগ নাই। যারা বর্তমানে বিপ্লবী সরকার বা কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বা নির্বাচনী বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত আছেন—তাঁরা তাঁদের কাজটা করবেন আশা আছে।

কিন্তু আগামীকালের 'পলিটিক্যাল কালচার' কি হবে, সেইটা নির্ভর করবে আজকের 'কালচারাল পলিটিক্সের' উপর। সিনেমাকে উছিলা করে আমি আজকে সেইজন্যই 'কালচারাল পলিটিক্সের' এই অস্বস্তিকর আলোচনাটা তুললাম। সামনে অন্যান্য কালচারাল ফ্রন্টেও এই আলোচনাটা বারবার তুলতে হবে। আজকে এই আলোচনা এড়ায় গেলে, পুরানো প্রশ্নগুলা আবার ফেরত আসবে, হয়তো আরও রক্তাক্ত আরও ভয়ংকর রূপে। এবং সেই ভয়ঙ্করের শুরুটা হবে কালচারাল ফ্রন্টেই। সামান্য খোঁজ নিলেই জানা যাবে, ১৭৭১'র ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহ থেকে গত আড়াইশো বছরের ইতিহাস, প্রত্যেকটা দশক সেই সাক্ষীই দিচ্ছে।

- ***৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জুলাই গণপরিসর'-এর সেমিনারে ধারণাপত্র হিসাবে উপস্থাপিত।***

Share on Facebook Tweet Follow us

Previous Post

বাংলাদেশের ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পটভূমিতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ২০২৪

Next Post

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ : শিক্ষা নিয়ে কিছু প্রস্তাব

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *